আবৃত্তিশিল্পের স্বাতন্ত্র্য ও জনসংযোগ

প্রদীপ ঘোষ

(আলোচনা ঃ পুনর্মুদ্রন)

শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ এবং আমার আবৃত্তি আকাদেমীর ভাইবোনেরা, আমি প্রথমেই একটা কথা অকপটে বলতে চাই যে, এই ধরনের আলোচনা করতে গেলে যে অভিজ্ঞতার দরকার হয়, সেই পরিমাণ অভিজ্ঞতা আমার নেই। যাতে উপস্থিত সকলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়, সেজন্য আমরা পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি।

আবৃত্তিশিল্পের এখনকার অবস্থাটা হলো এই --আমরা যাত্রা শু করেছি। আমরা দাবী করছি যে, আমাদের লক্ষ্য স্থির। কিন্তু প্র্ন করলে একেবারে সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না যে, আমরা এই লক্ষ্যে যেতে চাই। সেটা বোধহয় কোনো শিল্প সম্পর্কেই নিশ্চিত হওয়া যায় না। তা, আমরা এই যে যাত্রা আরম্ভ করেছি, সে যাত্রায় অভিযাত্রী অনেক। এই মহাযাত্রায় কেউ পৌঁছবে, কেউ পৌঁছবে না, অনেকে হয়তো হারিয়ে যাবে। কিন্তু অনেকে সফলও হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, য াত্রা শু হলে আমাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় যতোটা সাহায্য করে, কোনো একটা জায়গা থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বর্ণিত হলে বা নির্ণীত হলে ততোটা সাহায্য ঘটেনা ; সেক্ষেত্রে কিছুটা একপেশে হয়ে যায় ব্যাপারটা। আর প্রয়োগশিল্পের ক্ষেত্রে এই আলোচনার অবকাশ, আমার নিজের মনে হয় অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, কারণ যেকথা আমি বলবো সেই এক কথা আরো অনেকেই বলতে পারেন। অথচ প্রয়োগে দেখা যাবে, আমরা বোধহয় জনে-জনে একেবারেই আলাদা। সুতরাং এই বত্তব্য, প্রয়োগশিল্পের ক্ষেত্রে সব সময় দৃষ্টান্ত দিয়ে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। যদি আমি বলি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার মেজাজে, মানসিকতায়, স্বাদে পার্থক্য আছে, যেমন আছে কাজী নজল ইসলামের কবিতার সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার---এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিন্তু কোনো নতুন কথা বললাম না, কারণ এই কথা আরো অনেকে বলবেন। কিন্তু আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখেছি যে, অনেকেই ব্যত্তিকে (অর্থাৎ নিজেকে) প্রাধান্য দেন ব'লে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য এমনকি হাল আমলের অনেক কবির কবিতা তাঁদের কণ্ঠে একইভাবে উচ্চারিত, উৎসারিত হয়। এটা বোধের ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটায় কি না আমি জানি না, তবে উচ্চারিত হব ার সময় কিন্তু কোনো পার্থক্য আমরা ধরতে পারি না। আমার কাছে 'কে' এবং 'কী', এই দু'টো প্র্নই কিন্তু খুব জরী। আমি মনে করি 'কীভাবে' আবৃত্তি করবো সেটাই বোধহয় বড়ো। 'কে' আবৃত্তি করছেন সেটা তার পাশাপাশি থাকতে পারে, জরী, কিন্তু নিশ্চয়ই তার চেয়ে বড়ো নয়। তবে আবৃত্তিকারে আবৃত্তিকারে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকবে, তা না হলে দু'জন অ াবৃত্তিকার এক হয়ে যাবেন এবং তাঁদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশার কিছুই বাকি থাকবে না।

কিছুদিন আগে রবীন্দ্রসদনে একটি অনুষ্ঠান শুনতে গিয়েছিলাম। আমি সাধারণত আবৃত্তির অনুষ্ঠান শুনতে যাই। আমার চেয়ে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় কম এমন শিল্পীরা যেখানে থাকেন সেখানেও শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়েই যাই এবং আশা করি যে নিজেকে সমসাময়িক রাখতে হলে সেটা আমার পক্ষে জরী। সেখানে দশ-বারোটি দলের প্রায় একশ সত্তয়াশ আবৃত্তিক ারের আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি আন্তরিক আকাঙক্ষা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি কাগজ

থেকে আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, আমার কেমন লাগলো। আমি বলেছিলাম, "এঁদের অনেকেরই কণ্ঠস্বর খুব ভালো। উচচ রণও পরিশীলিত --যা আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমাদেরও অধিকাংশের ছিলো না।" এই প্রসঙ্গে তখন আমি একটি কথা খুব হাল্কাভাবে বলেছিলাম, "আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে এরকম বেশি পাইনি।" যাই হোক, সেই সংশ্লিষ্ট পত্রিকার যিনি প্রতিবেদক, তাঁকে আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন বলবো না, হয়তো অভিজ্ঞতার অভাবে তিনি আমার এই এতোগুলো কথা বাদ দিয়ে শুধু লিখেছিলেন, আমার সেই অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, 'আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে এমন কিছু পাইনি'। এই কথাটা আংশিক সত্য। এর আগেকার যে গুণগুলির কথা বলেছে তা কিন্তু সেই পত্রিকাতে উল্লিখিত ছিলো না, এটা খুব দুর্ভাগ্যের। আমাদের এই ধরনের প্রতিবেদক এবং সমালোচকদের মতামতের ওপর তুষ্ট বা ষ্ট হতে হয় এটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের। এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। আমরা নিজেদের কাজ সম্পর্কে যদি সচেতন হই তাহলে এই ধরনের পিঠ চাপড়ানি, বা দাবড়ানি সমালোচকদের কাছ থেকে পেলে কখনোই উল্লসিত বা বিমর্ষ হবো না। যদি ঠিকভাবে আবৃত্তি করতে না পারি তাহলে আমি হাজার প্রশংসা পেলেও নিজেকে নিশ্চয়ই সংশোধিত করব ার চেষ্টা করবো, আবার যদি কেউ আমার ব্যর্থতাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন তাঁর আলোচনায়, যদি সেটাকে যুক্তিগ্রাহ্য ব'লে মনে হয়, আমি সেটা গ্রহণ করতে চেষ্টা করবো। সে ব্যাপারে কোনোরকম মানসিক সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আব ার যদি মনেহয় এটা অকারণ সমালোচনা, তাহলে হাজার সমালোচক বললেও আমি কিন্তু অবিচলিত থাকবো।

এই কথাটা বলার প্রসঙ্গে আমি আবার আগের কথায় ফিরে যাই। 'আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেনি'---কথাটঅ ংশিক সত্য, তা আমি আগেই বলেছি, একটু জোর দিয়েই বলেছি. তার কারণ আমাদের প্রত্যেককে নিজের মতোভাবতে হবে। আমরা যারা বিভিন্ন দলে কাজ করি সেই দলের যিনি প্রধান আমরা তাঁর মতো হতে চেষ্টা করি। কিন্তুআমাদের বে াধহয় প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তাঁকে অতিক্রম করা বা তাঁর থেকে স্বতন্ত্র কোনো ভূমিতে নিজে দাঁড়ানো। আমাকে আসলে অ ারেকজন হতে হবে, তাঁর মতন নয়। তাঁর অনুবর্তী কিন্তু অনুকারী নয়। এখন এই কথাটাই বোধহয় আমার বন্ধু আবৃত্তিকার এবং আমার অনুগামী আবৃত্তিকারদের কাছে বিশেষভাবে নিবেদন করবার। সেই রাত্রে কিন্তু আমি দেখেছিলাম দশজন অ াবৃত্তিকারকে ওই একশ বারোজনের মধ্য থেকে। আমি চেয়েছিলাম কিন্তু একশ বারোজন আবৃত্তিকারকে কি একশ পঁচিশজন আবৃত্তিকারকে। সেইটে পাইনি ব'লেই আমার কষ্ট হয়েছে। এমনও দেখেছি একজন তণ আবৃত্তিকার যখন এক দলে আবৃত্তি করছেন (আমার অপরাধ নেবেন না, এটা কিন্তু আলোচনার আসর) তিনি একরকম আবৃত্তি করছেন, আবার তিনি যখন দল বদল করছেন তখন তাঁর আবৃত্তির ভঙ্গিও বদল ক'রে তাঁর মতো (সেই অন্য দলের প্রধানের মতো) হবার চেষ্টা করছেন।

দু'একটি ছেলে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, "আপনার কেমন লেগেছে?" তো, আমি তখন তাদের বলেছি, "ভালো লেগেছে। তোমার গলা, উচচারণভঙ্গি খুব ভালো। সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু তুমি তোমার মতো করলে ন া কেন?"

এখন এই ব্যাপারটাতে মুশকিল হলো এই যে, সেদিন অবশ্য সমবেত আবৃত্তির আসর ছিলো, সেখানে ওইভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। তার কারণ দলনেতারা একটা শৃঙ্খলা মেনে না চললে সমবেত আবৃত্তিকে উপস্থাপিত করা যায় ন া। সমবেত আবৃত্তির সম্ভাবনা সেখানে এবং বোধহয় সীমাবদ্ধতাও সেখানে। একক আবৃত্তির ক্ষেত্রে যেখানেআমরা অনেক স্বাধীনতা পেতে পারি এবং এই পরিধিকে অনেক ব্যাপ্ত, বিস্তৃত করতে পারি সেখানে সমবেত আবৃত্তিকে কিন্তু আমরা সেইভ াবে নিয়ে যেতে পারি না, যেহেতু আমাদের প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার জন্যেসমবেত ভাবে চর্চা করতে হয়। তাই, যদি বদল কিছু করতে হয় সে তো দলনেতাই করেন। সমবেত আবৃত্তি সম্পর্কেএইরকম কিছু দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় আম ার নিজের মনে হয়েছে সব কবিতার সমবেত আবৃত্তি হয় না। প্রতিস্পর্ধী কবিতার, প্রতিবাদ কবিতার নিশ্চয়ই হয়, যেটা অনেক কণ্ঠে, অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রয়োজন কিন্তু একক কণ্ঠে, নিভৃত পাঠে যে কবিতা আমরা বলতে পারি সেটা অন্য ধরনের মনোযোগ দাবী করে এবং সেটা নিছক সাময়িকউত্তেজনা তৈরি করবার দাবীতে উচচারিত হয় না, আত্মমগ্নতা

বা মননের কাছে তার আবেদন থাকে।

ইদানীং আরেকটা প্রশ্ন এসেছে যে, আবৃত্তি স্বতন্ত্রশিল্প কি না একযোগে অনেকে বলছেন যে, আবৃত্তি স্বতন্ত্রশিল্প নয় যাঁরা বলছেন যে, আবৃত্তি স্বতন্ত্রশিল্প নয় বা আদৌ শিল্প নয় দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে দু'দল আছেন--একদল সমালোচক, অ ারেকদল কবিরা নিজেরাই। কোনো কবির সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করেছি। এ ব্যপারে অভিজ্ঞতাটা খুব মজার। যখন কবি তাঁর কবিতা পাঠ করেন তখন সেখানে আমরা কবিকে পাই। সেখানে কবি যতোটা স্বরগ্রামের উত্থ ানপতন করলেন কিম্বা স্বরক্ষেপণের কতোটা কাকৃতি দেখালেন বা উচচারণে কী বৈশিষ্ট্য দেখালেন, সেটাকে ব্যক্তিগত একট া নমুনা হিসাবে ধরি। তাই আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেন কবি প্রধানত তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব দিয়ে। আবৃত্তিকারকের ভূমিকা কিন্তু আরেকটু আলাদা। আবৃত্তিকার সেই অর্থকে সঞ্চারিত করতে চান এবং তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে চান, যেটা রমাঁ রল্যাঁ তাঁর শিল্প সম্পর্কিত একটি গ্রন্থে স্পষ্ট ক'রে বলতে চেয়েছেন যে, শিল্পের উদ্দেশ্য হলো entertainment এবং instigation । নিছক entertainment নয়। নিছক entertainment হলে নির্দিষ্ট কোনো প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসার পর তার কোনো প্রতিত্রিয়া, কোনো রেশ আমাদের মধ্যে তেমন থাকে না। কিন্তু instigation কথাটা অনেক বড়ো। আমরা দেখেছি, পিকাসো, যুদ্ধের বিদ্ধে তাঁর গোয়ের্নিকা সিরিজের ছবি এঁকেছেন। তাঁকে যখন নাৎসী বাহিনী এসে জিজ্ঞসা করেছে, "এটা কী করছো" বা "এসব ছবি তুমি কেন এঁকেছো," তখন তিনি বলেছেন, "এটা তোমরাই এঁকেছো, আমি আঁ কিনি।" অত্যাচারের বিদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী লালসার বিদ্ধে তিনি শিল্প নিয়েই প্রতিবাদ করেছেন। আমরা কবিতাতেও এরকমই দেখেছি।

'কালো কবিতা' বা black poem বলতে আমরা যা বোঝাই, তাতে মার্কিন দেশে বা আফ্রিকা মহাদেশে আমরা দেখেছি, সমস্ত আন্দোলনের একটা মুখ্য ভূমিকায় ছিলো এই কবিতা এবং 'কালো সংস্কৃতি' ব'লে সেখানে একটা আলাদা সংস্কৃতির ধারাই তৈরি হয়েছে।

কিছুদিন আগে একজন black poet এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকক্ষণই পেয়েছিলাম নানা আলাপ আলোচনায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি নিজেকে একজন 'কালো কবি' হিসেবে চিহ্নিত করতে চান কেন? কবি তো কবিই। তা তিনি যে দেশেই জন্মান। হয় তিনি কবি নয়তো অ-কবি।" তিনি তখন আমাকেবলতে চেয়েছিলেন এইটেই, "একজন কবি সমাজ সচেতন হলে, তাঁর ভিতর কিছু কিছু নান্দনিক শর্ত পালিত হলে আমরা তাঁকে কবি বলি। কিন্তু 'কালো কবি' বলতে চেয়ে আমরা বোধহয় আরো কিছুটা বাড়তি মাত্রা জুড়ে দিতে চাই, সেটা হলো, আম ার কবিতার বক্তব্যে একটা প্রতিবাদ আছে, একটা ক্ষোভ আছে, একটা স্পর্ধা আছে এবং সেটার সামনে কোনো বাধার দেয়ালকেই আমি অপসারিত করতে কুণ্ঠিত হবো না। এমনকি এক্ষেত্রে আমার বুদ্ধি, আমার জীবন, আমার সমাজ, আম ার সংস্কার সবকিছু পণ রাখতেও আমি প্রস্তুত। এটাই বোধহয় যে কোনো অন্য একজন কবির থেকে আমার একটা স্বতন্ত্র সংকল্পের ব্যাপারে। যখন অত্যাচারিত শোষিত মানুষগুলোর চেহারা মনে পড়ে। তেমনি যারা অত্যাচার করছে তাদের বিদ্ধে আমার ক্ষোভটাকেও আমি স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই। সেখানে আমার কবিতা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত ক াব্যের শর্ত পালন না-ও করতে পারে এবং কবিতার মতো প্রচ্ছন্ন কিছু ব্যাপার না-ও থাকতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি আমার কবিতা আলাদাভাবে সেই কথাটাকেই স্পষ্টভাবে বলতে পারলো এবং সেখানেই আমার কবি হিসেবে সার্থকতা। আমি তাই নিজেকে black poet হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই, শুধু কবি হিসেবে নয়। এটা একটা স্বতন্ত্র connotation।"

এ কথার ভেতর অনেক যুক্তি আছে। এখন কবিদের মধ্যে যাঁরা কবিতা লিখে বিভিন্ন কবি-সম্মেলনে কবিতা পড়েন, আমি বলেছি যে তাঁদের ব্যক্তিত্বই আমাদের প্রধান আকর্ষণ, যে ব্যক্তিত্ব তিনি কবিতার সাধনা থেকে অর্জন করেছেন। ব্যাপারটা প্রায় অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আবৃত্তিকারকে কিন্তু আমরা আবার শুধু ব্যক্তিত্ব হিসেবেই দেখতে চাই না, তিনিকী পড়ছেন সেটাও আমাদের কাছে অনেক বেশি আদরণীয় এবং আকর্ষণের কারণ। কেননা, আবৃত্তিকার কবিতার ব্যাপারটাকে নিজস্ব ক'রে

নেন--কখনও দেখা যায় কবির সঙ্গে তাঁর ধ্যানধারণারও পার্থক্য ঘটে। কখনও কখনও দেখা যায়, যে কবি যা বলতে চেয়েছেন আবৃত্তিকার কিন্তু সেই পরিধিকে অনেক বেশি বিস্তৃত ক'রে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। এ অভিজ্ঞতা আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের জীবনেও হয়েছে একাধিকবার। এক-একটি কবিতাকে দেখেছি তার ব্যঞ্জনায়, বক্তব্যে, ব্যাপ্তিতে সে তার সীমা অতিক্রম করেছে, এমনকি কবিকেও বিস্মিত করেছে।

আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব'লে আপনাদের বিব্রত করতে চাই না বা সেটা খুব শোভনও হয়তো হবেনা। সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরে আমি হয়তো বলতে পারি। কিন্তু নিশ্চয় অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা হয়তো হয়েছে যে, অমুক কবিতার এই সম্ভাবনা ছিলো ব'লে কবি হয়তো লিখেছেন, কিন্তু একজন আবৃত্তিকার তাকেউপস্থাপিত করেছেন, ব্যবহার করেছেন বিশেষ একটা প্রয়োজনে। যখনই কোনো বিশেষ পরিবেশে সেই কবিতাটা উচ্চারণ করেছেন, তখনই সেট া সেই কবি এবং কবিতাকে ছাপিয়ে গিয়ে একটা অন্যতম বক্তব্য হিসেবে শ্রোতার কাছে পৌঁছেছে এবং শ্রোতা তাতে react করেছেন, একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এবং সেটা খুব সংহত প্রতিক্রিয়া।

আমি অবশ্য এমন ধরনের প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি না যেমন ক'রে 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই' ব'লে সেই fade in fade out ক'রে কণ্ঠস্বরের নানারকম খেলা দেখিয়ে আমরা খুব উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্য একটা জায়গায় চ'লে যাই। আম াদের মানসিক প্রস্তুতি সেইভাবে বাঁধি না এবং শ্রোতাকেও আমরা সেইভাবে মানসিক প্রস্তুতির সুযোগ দিই না। মোটামুটি কণ্ঠের কাকার্যে খুব মগ্ন-মুগ্ধ হয়ে তাঁরা যেমন কবিতার আসল বক্তব্য থেকে স'রে যান, আমি সেই পরিস্থিতির কথা বলছি না। যদি খুব স্পষ্টভাবে 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' বলা যায় এবং ওরকম ঠাণ্ডা-ঘরের প্রকোষ্ঠে নিছক বিনোদনের উদ্দেশ্যে তা যদি না হয়, যদি সেরকম অর্থে, সে রকম পরিবেশে পরিবেশন করা যায়, তাহলে সত্যিই 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' এই কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং যাত্রা শু হতে পারে।

আপনারা নিশ্চয় জানেন এটা সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা এবং এটা লেখা হয়েছিলো একটা সংগ্রামের পটভূমি থেকেই। যখন ফতিমা জিন্না হেরে গিয়েছিলেন মহম্মদ আলি অয়ুবশাহীর বিদ্ধে, তখন এটা লেখা হয় এবং এবং এই কবিত াকে কেন্দ্র ক'রে সেখানকার মানুষ শপথ নিয়েছিলেন যে, 'আমরা এই মিলিটারি শাসনের বিদ্ধে, এই জঙ্গীশাহীর বিদ্ধে লড় াই করবো।' তাই এটা কিন্তু লড়াইয়ের কবিতা। কিন্তু আজ তাকে আমরা যখন এপারে পড়িতখন কিন্তু কবিতার ব্যঞ্জনা ওই অর্থে আমরা প্রকাশ করি না। শ্রোতারাও কণ্ঠের নানারকম কাকাজে মোটামুটি তৃপ্ত হয়েই চ'লে যান। এখানে কবিত ার মূল থেকে আবৃত্তিকার ও শ্রোতা উভয়েই স'রে আসছেন। তার যে পটভূমি, সেই পটভূমির সঙ্গে পরিচয় নেই ব'লেই এই ঘটনাটা ঘটেছে।

আমার নিজের জীবনেও আমি ব্যর্থতার কথাই বলি, সার্থকতার কথা ব'লে, আপনাদের বিব্রত করতে চাই না। বাংল াদেশ থেকে আমরা একটি L.P.Record বেরিয়েছিলো কুড়ি জন বাংলাদেশী কবির কবিতা নিয়ে। সেটা অবশ্য এদেশে প াওয়া যায় না। তা, সেখানে শহীদ কাদ্‌রীর একটি কবিতা আমি record করেছিলোম---'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'। এখানে খুব মজার কথা আছে, 'একটি বেলফুল দিলে চারটি কার্ডিগান পাওয়া যাবে; একটি চন্দ্রমল্লিকা ভাঙালে চারলক্ষ টাকা, ইত্যাদি ইত্যাদি'। তো, সেই কবিতাটিকে আমি একটা আদ্যন্ত কৌতুকের কবিতা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম।

কিছুদিন আগে আমি চট্টগ্রাম শহরে এই কবিতা যখন আবৃত্তি করলাম, শ্রোতারা দাণভাবে নিলেন, কলকাতাতেও শ্রোত ারা অনেক জায়গায় নিয়েছেন। কিন্তু ঢাকা শহরে যখন গেলাম সেখানে জানলাম, শহীদ কাদ্‌রী এবং তাঁর কবি বন্ধু - ব ান্ধবরা বলেছেন যে, আমি আবৃত্তিকার হিসেবে যাই হই না কেন, আমি শহীদ কাদ্‌রীর ঐ কবিতার মেজাজটা ধরতে পা রিনি। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই একটা ভাবনার ব্যাপার হয়েছিলো, কেননা আমার ধারণা হয়েছিলো ওটা কৌতুকেরই কবিতা।

তা, শহীদ কাদ্‌রীর সঙ্গে আমার দীর্ঘসময় ধ'রে এইসব নিয়ে কর্থাবার্তা হলো। তিনি বললেন, ''না, তা নয়, আসলেব্যাপ ারটা হলো এই যে, ঢাকা শহরে একটি সাড়ে ন'বছরের ছেলে বা মেয়ে, কখনো কারফিউ ছাড়া রাত্রি দেখেনি। এ প্রতিশ্রুতি হলো সেই প্রতিশ্রুতি, যে পিতা তার আবদার করা সন্তানকে বলেন, 'হ্যাঁ তোমাকে সাটিনের জামা এনে দেবো, এই দেবো সেই দেবো', যা কোনদিনই পালিত হবে না। সেই স্বামীর প্রতিশ্রুতি, যে কোনদিনই তাঁর স্ত্রীকেসম্বৎসরের হেঁসেলের সেই ব্যবস্থা জুগিয়ে দিতে পারবেন না। তাই এই অশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থতার একটা কণ কাহিনীও আছে এবং একটা বেদনাও আছে।'' এখন সেই বেদনার সুরটা আমি ধরতে পারিনি, যেহেতু বাংলাদেশের সেই পটভূমির সঙ্গে আম ার ব্যক্তিগত পরিচয় সেইভাবে হয়নি বা কবির কাছ থেকে তার মানসিকতার খবর নিতে পারিনি। এটাই নাকি সামগ্রিকভ াবে আমার ব্যর্থতা।

আমি শহীদ কাদ্‌রীভাইকে বললাম, ''আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার পড়ে দিন।''

তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে যখন প'ড়ে শোনালেন তখন দেখা গেলো তিনি কৌতুককে প্রচ্ছন্ন রেখে কাণ্য এবং কৌতুক এই দু'টো রসকে প্রায় পাশাপাশি দেবার চেষ্টা করেছেন। আমার কাছে কবিতাটার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেলো এবং ঋাস কণ তারপরে আমি কবিতাটি কলকাতায় দু-এক জায়গায় পড়েছি, কিন্তু তখন আমার চোখে জল এসেছে। অ ামার মুখে হাসি থাকলেও চোখে জল। সে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি ভেতরে ভেতরে শিহরিত হয়েছি।

'দুই পাখি' কবিতাটি আপনারা সকলেই জানেন, এটা বিখ্যাত একটা গানও। চট্টগ্রাম শহরে আমি একবার এই কবিতাটি পড়লাম। সবচেয়ে মজা হলো কবিতাটি শেষ করবার পর প্রায় হাজার দেড়েক মানুষের সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস সমুদ্রের জলে াচ্ছাসের মতো আমাকে আত্রমণ করলো এবং আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না, পরবর্তী কবিতা আরম্ভই করতে প ারলাম না। পরবর্তী নির্ধারিত কবিতার বদলে অন্য কবিতা দিয়ে আমাকে আবার মেজাজে ফিরে আসতে হলো। তার পরের দিন আমার চট্টগ্রাম ঋবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান ছিলো। সেখানে আমি অনুষ্ঠান করার জন্য উঠতেই ছাত্রছাত্রীরা আমাকে অনুরোধ করলেন 'দুই পাখি' বলতে। আমি খুব বিস্মিত হলাম। কারণ এখানে অর্থাৎ এদেশে আমি 'দুই পাখি' অনেকবার বলেছি কিন্তু কোনো প্রতিত্রিয়া হয়নি বরং একটি প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিকে এমন হাস্যকর সমালোচনাও শুনেছি যে, 'এমন বিখ্য াত গানকে উনি যে কেন আবৃত্তি করতে গেলেন বোঝা গেল না।' কিন্তু যাইহোক বাংলাদেশে আমার অভিজ্ঞতা হলো অন্যরকম। আসলে 'দুই পাখি' কবিতাকে তাঁরা ভেবেছেন দুই দেশেরসাংস্কৃতিক মানুষের আর্তি। এখানে যে কবিতার এই ব্যঞ্জনা লুকিয়ে ছিলো তা ঠিক ওই পরিবেশে না গেলে কখনোই আমার মনে হতো না।

তার কিছুদিন পর আমি ঢাকায় গিয়েছি তাঁদের শহীদদিবস উপলক্ষে। আমি দেখেছি প্রায় দু-তিনশ ছেলেমেয়ে এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে। আমাকে তাঁরা রাত্রি দেড়টা দু'টোর সময় সেখানকার মঞ্চে তুলেছেন। এমনিতে সেখানে কারো যাবার নিয়ম নেই, তাছাড়া আমার হাতে ফুলও ছিলো না। আমি ভেবেছিলাম আমার প্রবেশাধিকার থাকবে না। কিন্তু ঘটনাচত্রে ঢাকা ঋবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'ডাকসু'-র নেতারা আমাকে মঞ্চে নিয়ে যান এবং মাইত্রোফোনে আমাকে অনুরে াধ করেন কিছু বলতে। এইখানে যখন তাঁরা আমাকে কিছু বলতে বললেন এবং আমাকে তাঁরাপশ্চিমবঙ্গের মানুষ ব'লে চিহিত করলেন, তখন আমি বললাম যে, আমি পশ্চিমবাংলার সমস্ত সংস্কৃতিপ্রেমী এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষ থেকে আমাদের এবং আপনাদেরও প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটি আশাই ব্যক্ত পারি আপনাদের কাছে, তা হলো---

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়--
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

এই 'ত্রাণ' কবিতাটা আমি এখানে হয়তো প্রার্থনার কবিতা হিসেবেই পড়ি। কিন্তু 'ত্রাণ' কথাটার বিশেষ অর্থ বা ব্যঞ্জনা আ

মি এখানে কখনো পাইনি। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারীর মধ্যরাত্রে, মানে, বিশে আর একুশে ফেব্রুয়ারীর মধ্যরাত্রে, যে জনতা ওখানে থাকেন তাঁরা বোধহয় বাহান্ন সালের সেই শহীদদের কথা ভুলতে পারেন না, ভাষা আন্দোলনের কথা ভুলতে পারেন না এবং তাঁরা বোধহয় বোঝেন যে, এটা তাঁদের অস্তিত্বের লড়াই এবং তখন তাঁরা 'এ দুর্ভাগ্যদেশ হতে,হে মঙ্গলময়, দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়' বলতেই চিৎকার ক'রে ওঠেন এবং আমাকে সম্বর্ধিত করেন। আসলে আমাকে নয়, তঁারা সেই বক্তব্যকেই সম্বর্ধিত করেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা নতুনভাবে চেনেন এবং এই কবিতাকে তাঁদের দেশের পটভূমিতে, তাঁদের দেশের মাটিতে তাঁরা নতুন ক'রে পান। কবিতার নাম কেন 'ত্রাণ' সেটা আমি পশ্চিবাংলায় বা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে বা পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় গিয়েও বুঝিনি, যেটা আমি বাংলাদেশে গিয়ে বুঝেছিলাম এবং প্রতিটি শব্দ যখন উচ্চারণ করেছি, যেমন 'লোকভয়'--তাঁরা হাততালি দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠেছেন। 'রাজভয়', 'মৃত্যুভয় আর'--আমাকে এই কথাগুলি ফিরে বলতে হয়েছে। তখন তাঁরা উত্তাল।

এই কবিতাটিকে নতুনভাবে একটা নতুন সঞ্জীবন হিসেবে যেমনভাবে ওখানে আমি পেয়েছিলাম তেমনভাবে এখানেকখনো পাইনি। এবং সেই সারা দিন সারা রাত আমি স্পন্দিত ছিলাম। যখনই কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে, মনে হয়েছে এই মানুষটি নিশ্চয়ই এই কবিতা থেকে অন্য একটা মানে খুঁজে পেয়েছেন, যেটা আমি এতদিন আবৃত্তি করা সত্বেও পাইনি।
কবিতা আবৃত্তি স্বতন্ত্রশিল্প কি শিল্প নয় এ প্রশ্ন যাঁরা তোলেন আমার মনে হয় তাঁদের কিছুটা অভিজ্ঞতার অভাব, কিছুটা হয়তো ঈর্ষা, কিছুটা হয়তো তাঁদের এক ধরনের হীনমন্যতার প্রবণতা আছে, এটা আমি খুব দায়িত্ব নিয়েই বলছি। কোনো সমালোচক যখন এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা লিখেছেন কোনো কোনো পত্র পত্রিকায়, তাঁদের দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেছেন, বেশতো, খুব ভালো কথা, আপনি প্রতিবাদ ক'রে পাঠান। একটু চিঠিপত্রে আলোচনা হোক। আসলে বোধহয় আমাদের ওপর দিয়ে তাঁরা নিজেরা বিখ্যাত হতে চেয়েছেন। কারণ একজন সমালোচক লিখেছিলেন আবৃত্তিশিল্প পরগাছা, আবৃত্তি স্বতন্ত্রশিল্প নয়। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেই আমার যখন দেখা হয়েছিলো, আমি ও ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'ওই একটু লিখলাম আর কি? তো, আপনিও লিখুন না, তাহলে বেশ ভালো হয় দু-একটা চিঠিপত্র ছাপা হয়। আমি বললাম যে, হ্যাঁ, তাহলে প্রত্যেকটা টিঠিতেই বেশ আপনার নাম ছাপা হয়। আমি ওর মধ্যে নেই। আপনিও যেটা বলেছেন আপনি নিজেও জানেন যে এটা ঠিক নয়। কারণ আবৃত্তি যদি পরভোজীশিল্প হয় তাহলে সঙ্গীত কি তার থেকে আলাদা? নাটক কি তার থেকে আলাদা? একা একা একটা লোক নাটক কী ক'রে করতে পারে? তাকে আলো দিতেই হবে, তাকে মঞ্চসজ্জা দিতেই হবে এবং যদি মঞ্চ বড়ো হয় তাহলে microphone -ও লাগবে।

যাই হোক আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, যেখানে আবৃত্তির এই অবস্থা সেখানে আমাদের কণ্ঠ দিয়ে, আমাদের চর্চা দিয়ে আমরা অনেকের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারি কবিতাকে। আমাদের প্রয়োজন একটা কবিতা, যে কবিতা একজন কবি লিখেছেন। অথবা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি আবৃত্তিকার নিজেও কবিতা লিখেছেন। যেমন আমার পাশেই রয়েছেন অগ্রজপ্রতিম আবৃত্তিকার নীলাদ্রিদা। তিনি নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন এবং তিনি নিজে জানেন গ্রামে গঞ্জে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়। আবৃত্তিকার যে সবসময় অন্যের কবিতা আবৃত্তি করেন তা নয়। আর অন্যের কবিতা যদিআমি আবৃত্তি করি এবং সেটাকে স্বীয়করণ করি, তাহলে সেটা সাময়িকভাবে আমার বক্তব্য হিসেবে কি উপস্থাপিতহয় না? নিশ্চয়ই হয়। কেননা আমি কবিতার সঙ্গে সেই মানসিকভাবে সহঅবস্থান কি ব'লে, তার অংশী ব'লে সেই ভাবনাকে শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাই ব'লেই তো আমি সেই কবিতা উচ্চারণ করছি। অবশ্য আজকাল দুঃখের সঙ্গে দেখেছি যে আবৃত্তির আসরের নামে অনেক অ-কবিতা পড়া হয়। হাততালি পাবার জন্য শ্রতিনন্দন কবিতা হয়, যেটার মধ্যে মনের ব্যাপার থাকে না। তাই আবৃত্তির জনপ্রিয়তার মূলেও যেমন এটা, তেমনিএকদিন আস্তে আস্তে আবৃত্তির আসর থেকে শ্রোতাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ক'মেও যেতে পারে, যখন ব্যাপারটাকে একঘেয়ে লাগবে। কারণ আমরা যদি দাবী করি যে, শ্রোতা তৈরি হচ্ছে প্রতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে আমাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমরা যেন শ্রোতাকে অধিকতর কবিতার দিকে নিয়ে যেতে পারি। তার কারণ শ্রোতা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি সে দায়িত্ব পালন না করি, আবৃত্তি তাহলে একটা উচচকিত শিল্পই হয়ে থাকবে। সেটা কখনো আমাকে সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ করবে না।

যেমন ধন একটি কবিতার কথা বলছি "চাল পাচ্ছি, ডাল পাচ্ছি...।খাচ্ছি - দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু-বেলা পার্কে যাচ্ছি, মাইত্রোফোনে কথা শুনছি, ঝাঁকের কই, ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি"....এই যে কবিতাটা, এটা এদেশে ছাপা হয়েছিলো শামসুর রহমানের 'নিজ বাসভূমি' গ্রন্থে। সেই গ্রন্থে এই কবিতার আরও একটি স্তবক ছিলো যে, "দোহাই, আপনারা চুপ কন। কানের কাছে বিড়বিড় করবেন না... আমার কাজ আমাকেই করতে দিন".. ইত্যাদি। এই কবিতাটা বাংলাদেশের যে বইটা থেকে আমি রেকর্ড করেছি, সেই বইটাতে কবি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। যে মুহূর্তে আমি দেখলাম যে, স্তবকটা ওই গ্রন্থে নেই সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো এর নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী ? কবিতাটা আমি বারবার পড়লাম। এখানে কারো কারো কাছে কবিতাটা আমি আবৃত্তিশুনেছি, সেখানে প্রধানতঃ এটা ব্যঙ্গ হিসেবেই ইপস্থাপিত হয়েছে। আমি কবিতাটা আবার প'ড়ে দেখলাম। এই যে'ঝাঁকের কই, ঝাঁকে নিশে যাচ্ছি'--এতে খালি কৌতুক বা ব্যঙ্গ নেই, আত্মসমালোচনা আমাকে অন্তর্মুখী করবে তারপর আর কিছুই ভালো লাগবে না। তখন সেই অন্তর্মুখীনতা থেকে আমার একটা সংকল্প তৈরি হবে। সুকান্তর 'বোধন' কবিতায় আমরা চিৎকার ক'রে অনেককে বলতে শুনেছি, "আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়, দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়"। এই 'আস্ফালন নয়' শব্দটা দিয়েই কি সুকান্ত বোঝাতে চাননি যে, এটা চিৎকার ক'রে বলবার কবিতা নয়, এটা একটা সংকল্পের কবিতা। এমন একটা সংকল্প নেবো যার দ্বারা আমি শোষণের বিদ্ধে প্রতিবাদ করবো। আমরা যখন, "হে মহামানব, একবার এসো ফিরে" বলি, তখন কি আমরা সত্যিই কোনো জীবন্ত মহামানবের মূর্তিকল্পনা করি ? তা তো নয়। আমার ভেতরের বিকাশ, সেটাকেই আমি আহ্বান করি এবং তা আমরা যদি না ভাবি তাহলে নিশ্চয়ই 'হে মহামানব' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিসত্তাকে ভাববো যিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা হতে পারেন, সাহিত্যিক নেতা হতে পারেন এবং তিনি নেই ব'লে আমরা অথর্বের মতো, অসহায়ের মতো বসে থাকবো, আমাদের কিছু করবার নেই ব'লে। বদলে আমরা যদি মনে করি যে, মহামানব আমাদের মধ্যেই আছে, তাহলে বোধহয় ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো আপোষ থেকে আমরা নিজেদের মুক্তি দিতে পারি এবং দৈনন্দিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি। হয়তো কোনো বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোনো কাজের ব্যাপারে আমাদের সংহতির প্রয়োজন আছে।সেখানে নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে কিন্তু সে নেতৃত্ব যদি নিছক 'ময়দানের মিছিল'-এর নেতৃত্ব হয় তাতে আমার কোনো আস্থা নেই। তিন্তু সেই নেতৃত্ব যদি বলে যে, হ্যাঁ, আমি তোমাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবো, তাতে তার আগে তোমার ব্যক্তিগত এই প্রতিশ্রুতির দরকার যে, 'দু'টো টি বা কিছু পয়সা বা জি--রোজগারের লোভ দিয়ে লোক জড়ো করার প্রয় আমি নেই' ---তাহলেই সেই চেতনার বোধন হয়, তাহলেই কিন্তু সুকান্তর 'বোধন' কবিতা আমরা অন্যভাবে পাই। তা নাহলে এটা একটা নিছক কবিতাই থেকে যায়। কেননা আমি একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রীকে এই কবিতা Jazz Music Set এর সঙ্গে রবীন্দ্রসদনে বলতে শুনেছি এবং শ্রোতাদের কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে, আপনি প্রতিবাদ করেননি কেন? আমি বলেছি, "দেখুন, প্রতিবাদ করার মতো কিছু তো ঘটেনি কারণ তিনি আপনাদের দ্বারাই সম্বর্ধিত হলেন এবং আমার কাছে প্রতিপন্ন হলো যে, 'বোধন' কবিতায় তাঁর মধ্যে বোধন ঘটেনি।" 'কবিতাকে বুঝুন'--এই কথা কবিতা বলতে হবে না, আবৃত্তিকারকে সেইভাবে অনুভব ক'রে উচ্চারণ করতে হবে। সেইভারে উচ্চারণ না ক'রে আবৃত্তিকার যদি কণ্ঠের কাকার্য বা ভাবের লালিত্য বা অন্য কিছুর চমৎকারিত্ব আরোপ করেন যেটা শুধু তারিফই এনে দেয়, তাহলে কিছু বলাই বৃথা।

আমি বালিগঞ্জে একাট জায়গায় চাঁদের আলোয় কবিতার আসরে কবিতা শুনেছিলাম। তো, সেখানে এক কবি মেজাজে বলেছিলেন, "আমি পিয়েছি এক নতুন শরাব---শরাবের নাম হাততালি।" আমার মনে হয় আমরা অনেকেই বোধহয় এই শবার 'পিয়েছি' এবহ শরাব পিয়েছি ব'লে অনেকেই বোধহয় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আছি। আর তাই বোধহয় সুস্থ কাব্য ও কবিতার কাছ থেকে অনেকটা দূরে স'রে আছি। তার মানে এই নয় যে, সবাই তার করছি বা সব কবিতাই সেইভাবে হচ্ছে আসলে আমার এই ব্যাপারটা একটু কষ্টের ব্যাপার। আপনারা বলবেন যে, আপনিও তো মমশাই এই কবিতা করেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করি, কারণ আমিও তো এর বাইরে নই, আমার মধ্যেও তো সেই উত্তরণের সংগ্রাম চলছে, নিজের ভেতরে। 'কামাল পাশা'--কে আমি নিশ্চয়ই অ-কবিতা বলবো না কিন্তু এটাকে নিশ্চয়ই সেই অর্থে কবিতা বলবে না, জীবনানন্দের কবিতা যে অর্থে কবিতা। আমি যখন জীবনানন্দ পড়তে যাই তখন নিশ্চয়ই আশা করবো শ্রোতারা আমার কাছে আরো

জীবনানন্দের কবিতা শুনতে চাইবেন। সেখানে যদি তাঁরা ‘কামাল পাশা’-র দাবী তোলেন, আমি মনে করবো আবৃত্তিকার হিসেবে আমি ব্যর্থ, তা সে, ‘কামাল পাশা’ সম্পর্কে আমার যতো খ্যাতিই থাক না কেন? আসল ব্যাপারটা হলো এই যে, আমি শ্রোতাকে instigate করতে পারছি কি না। আমি যখনই দেখবো শ্রোতারা আমার কাছে জীবনানন্দের কবিতা এবং ‘কামাল পাশা’ একসঙ্গে চাইছেন, আমি মনে করবো যে আমি ব্যর্থ। আমাদের এরকম আত্মতুষ্টিতে তৃপ্ত হবার কোনো কারণ নেই যে, হাততালি পেলাম আর বাড়ি গিয়ে আরাম ক’রে ঘুমিয়ে পড়লাম, পরের দিন সকালটা খুব প্রসন্ন মনে হলো। এই ধরনের আত্মতুষ্টি এবং মোহ থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে। তা নাহ’লে কিন্তু আবৃত্তিকে স্বতন্ত্রশিল্প বলতে যাঁরা নারাজ, যাঁরা আবৃত্তিকে পরভোজীশিল্প বলছেন আমরা তাঁদের পিছনে সংকোচে একটু জায়গা খুঁজবো এবং কবে একটু ভালো বলবেনতার জন্য লালায়িত থাকবো এবং দেখা হ’লে বিগলিত হাসি দিয়ে বলবো, “অমুকদা, কেমন আছেন?” বা “অমুকদি, ভালো আছেন তো?”--এইসব বলতে হবে শরাব--শরাবের নাম হাততালি।” আমার মনে হয় আমরা অনেকেই বোধহয় এই শরাব ‘পিয়েছি’ এবং শরাব পিয়েছি ব’লে অনেকেই বোধহয় নেশাগ্রস্থ অবস্থায় আছি। আর তাই বোধহয় সুস্থকাব্য ও কবিতার কাছ থেকে অনেকটা দূরে স’রে আছি। তার মানে এই নয় যে, সবাই তাই করছি বা সব কবিতাই সেইভাবে হচ্ছে। আসলে আমার এই ব্যাপারটা একটু কষ্টের ব্যাপার। আপনার বলবেন যে, আপনিও তোমশাই এই কবিতা করেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করি, কারণ আমিও তো এরা বাইরে নয়, আমার মধ্যেও তো সেই উত্তরণের সংগ্রামচলছে, নিজের ভেতরে। ‘কামাল পাশা’-কে আমি নিশ্চয়ই অ-কবিতা বলবো না কিন্তু এটাকে নিশ্চয়ই সেই অর্থে কবিতা বলবো না, জীবনানন্দের কবিতা যে অর্থে কবিতা। আমি যখন জীবনানন্দ পড়তে যাই তখন নিশ্চয়ই আশা করবো শ্রোতারা আমার কাছে আরো জীবনানন্দের কবিতা শুনতে চাইবেন। সেখানে যদি তাঁরা ‘কামাল পাশা’-র দাবীতোলেন, আমি মনে করবো আবৃত্তিকার হিসেবে আমি ব্যর্থ, তা সে, ‘কামাল পাশা’ সম্পর্কে আমার যতো খ্যাতিই থাক না কেন? আসল ব্যাপারটা হলো এই যে, আমি শ্রোতাকে instigate করতে পারছি কি না।আমি যখনই দেখবো শ্রোতারা আমার কাছে জীবনানন্দের কবিতা এবং ‘কামাল পাশা’ একসঙ্গে চাইছেন, আমি মনে করবো যে আমি ব্যর্থ। আমাদের এরকম আত্মতুষ্টিতে তৃপ্ত হবার কোনো কারণ নেই যে হাততালি পেলাম আর বাড়ি গিয়ে আরাম ক’রে ঘুমিয়ে পড়লাম, পরের দিন সকালটা খুব প্রসন্ন মনে হলো। এই ধরনের আত্মতুষ্টি এবং মোহ থেকে আমাদের মুক্ত হইতে হবে। তা নাহ’লে কিন্তু আবৃত্তিকে স্বতন্ত্রশিল্প বলতে যাঁরা নারাজ, যাঁরা আবৃত্তিকে পরভোজীশিল্প বলছেন, আমরা তাঁদের পিছনে সসংকোচে একটু জায়াগ খঁজবো এবং কবে একটু ভালো বলবেন তার জন্য লালায়িত থাকবো এবং দেখা হ’লে বিগলিত হাসি দিয়ে বলবো, “অমুকদা, কেমন আছেন?” বা “অমুকদি, ভালো আছেন তো?”---এইসব বলতে হবে আমাদের। কিন্তু যদি আমরা নিজেরা সঠিক পথে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে বোধহয়, ওঁরা কি বললেন, না বললেন কিছু আসে যায় না। আমি শম্ভু মিত্র মশায়ের কাছেই শুনেছি যে, এক সমালোচকএকবার বলেছিলেন, ‘রক্তকরবী’তে ‘বহুরূপী’ ‘রক্ত’--কে দেখালেন, ‘করবী’--কে পদদলিত করলেন। পরবর্তীকালে তিনিই বলেছেন, “ধন্য, শম্ভু মিত্র, ধন্য।” তাহলে দেখুন, সমালোচকদেরই ফিরতে হবে আমাদের নয় যদি আমরা সঠিক পথে থাকি।

যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ক’রে তারিফ কুড়িয়ে থাকেন তাঁদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সতর্কতা প্রয়োজন। বন্ধু হিসেবে, ভাই হিসেবে, আবৃত্তি আকাদেমীর ভাইবোনেদের কাছে আমার অনুরোধ যে, এই আত্মতুষ্টিতে ভুলে কোনো লাভ নেই। অবশ্য সেটাও এক ধরনের তুষ্টিই বটে। কারণ সেটা আমার পরিবারের লোকজন দেখবে, কাগজের কার্টিং রেখে দেবে, আমার মেয়ে, আমার ছেলে দেখবে। কিন্তু তার দ্বারা আবৃত্তিশিল্পের স্বাতন্ত্র্য দাবী করা যায় না। তার জন্যে একটু কষ্ট করতে হবে, একটু গালাগাল খেতে হবে, হয়তো অনেককে ফিরিয়েও দিতে হবে, কিছু করার নেই। কেননা যে কোনো সাফল্যের রাস্তা কিন্তু খুব কঠিন। তবে আবৃত্তিশিল্প সম্পর্কে আমার এইভাবে বলার একটাই কারণ যে, আমরা যখন এইভাবে আবৃত্তি আরম্ভ করেছিলাম, নীলদ্রিদা যখন আবৃত্তি আরম্ভ করেছিলেন তখন কিন্তু এতো ভিড় ছিলো না। তখন কিন্তু এতো মানুষ ছিলেন না, আবার ছিলেনও এবং যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নিভৃত -চর্চা করতেন। এ আমরা জানি, আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি। তা নাহলে আমরাই বা আবৃত্তিতে আকৃষ্ট হলাম কেন? আমরা দেখেছি যে, কোনো ঘরোয়া আসবে আমাদেরই পাড়ার কেউ বা আমাদেরই বাবা জ্যাঠামশাই এতো অসাধারণ আবৃত্তি করতেন যে, আমাদের গান শেখার কথা মনে হব

ার আগে আবৃত্তি উচচারণের কথা মনে হয়েছে, মনে হয়েছে। সেজন্যে নিভৃত-চর্চা ছিলো। এই তো, বাইপুর, খুব কাছেই, বেশি দূরে নয়, সেখানে একজন মানুষ আছেন, শম্ভু মিত্র ('বহুরূপী'--খ্যাত শম্ভু মিত্র নন)। কী নিষ্ঠাবান মানুষ, প্রাজ্ঞ, প্রৌঢ়। তাঁকে আমরা হয়তো কেউচিনি না। সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হলো। দেখলাম, কী গভীর শ্রদ্ধা এবং মননের সঙ্গে তিনি আবৃত্তিকে দেখেন। এই ধরনের মানুষ কিন্তু আমাদের সমাজে, সংসারে, দেশে-দেশে এখনও আছেন।

আবৃত্তিকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার ব্যাপারটা কিন্তু অতি সাম্প্রতিক। আগের দিনের অভিনেতারাও কিন্তু আবৃত্তিকে আলাদা মর্যাদা দিয়ে এখানে আসেননি। তাঁরা নিজেদের উপস্থাপিত করবার সূত্র হিসেবে অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে জননসংযোগের মাধ্যমে হিসেবে এসেছিলেন। যে কারণে তাঁরা সারা জীবনে যতো আবৃত্তি করেছিলেন, আমরা এক একটা আসরে তার চেয়ে অনেক বেশি আবৃত্তি করি। এখন মজা হলো এই যে, আমাদের নিষ্ঠাটা অনেক বড়ো। আমরা যারা অ াবৃত্তি করি, আমাদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তবে হ্যাঁ, পথ কিন্তু অনেক বাকি। তবু 'অনেক হ'লো দেরী, আজো তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি---' এ কথাটা বলতে পারছি না, কারণ অনেক দেরী হয়নি। আর এখনই সাফল্যের জন্যে ব্যগ্র হ'লে চলবে না এবং কারও পিঠ-চাপড়ানিতে আমাদের খুব তুষ্ট হ'লেও চলবে না।

এই আবৃত্তির ব্যাপারে কবিতা নির্বাচন যেমন একটা জরী ব্যাপার, তেমনি পরিবেশ নির্বাচনও একটা জরী ব্যাপার, শ্রোত ারা আমাদের ওপর তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ চাপিয়ে দেবেন, এইটে কিন্তু পুরোপুরি মেনে নিলে চলবে না। পাঁচমিশেলি শ্রে াতার আসরে আমরা নিশ্চয়ই যাই এবং যাবোও। তখন আমাকে হয়তো এমন একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানেরপর অথবা এমন একজন চলচিচত্র অভিনেতার নাম ঘোষণার পর উপস্থাপিত করা হলো যেখানে আমার সম্পর্কে হয়তো কোনো অভ্যর্থন াই নেই শ্রোতাদের কাছ থেকে। সেখানে হয়তো একটু আধটু আপোষ করতে হয়, সেটাও কিন্তু আমি শিল্পের স্বার্থেই করি। কেন শিল্পের স্বার্থে? কেননা আমি শ্রোতাকে আমার রাস্তায় টেনে আনবো আস্তেআস্তে। কিন্তু শ্রোতার চির সঙ্গে যদি আগাগোড়াই আপোষ করি তাহলে মুশ্‌কিল। আমার জীবনে একটা ঘটনাও ঘটেছে। যেমন ধন 'ফরিয়াদ' কবিতাটি। যে অর্থে অন্যান্য কবিতাকে আমরা শ্রুতিনন্দন ব'লে থাকি, সেই অর্থে একটা খুব একটা হাততালি পাবারও কবিতা নয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রে এটা উচচারিত হতে দেখি সেইভাবে। আমি কিন্তু এই কবিতা থেকে গ্রহণ করি একটা সংকল্প, 'মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান'। এইখানে আমি বুঝি যে, আমার মনটা মুক্ত হয়েছে, তারপর অন্য প্রতিবন্ধকতা থেকে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি. তারপর অন্য প্রতিবন্ধকতা থেকে অমি উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করছি। সুতরাং এই কবিতার বলবার একটা ধরন আছে (যদিও আবৃত্তিকারদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকতেই পারে, তবু একটা মোটামুটি ক াঠামো নির্দিষ্ট আছে)। তো, এই সম্পর্কে বলি, একবার একটা College Social-এ গিয়েছিলাম। সেখানে মজা হলো কি, তাঁরা কেউই শুনবেন না এসব আবৃত্তি-টাবৃত্তি। এটা প্রায় ১৮/১৯ বছর আগেকার কথা বলছি। তখন আমাকে করতে হলো কি, মাইত্রোফোনের volume বাড়িয়ে আমাকে খুব ওপর থেকে ধরতে হলো। দুটো স্তবক আমি খুব ওপর থেকে ধরলাম। ধরবার পর যখন তাঁরা মনে করলেন যে, এ ভদ্রলোক হয়তো খুব রাগী বা চীৎকার চ্যাঁচামেচি ক'রে হয়তো জম াবেন , তখন তাঁরা একটু চুপ করলেন। তারপর তৃতীয় স্তবক থেকে আমি আবার যেভাবে স্বাভাবিক আবৃত্তি করা উচিত, সেভাবে ক'রে উত্তীর্ণ হলাম। এখন আমি যদি আগাগোড়াই আপোষ করতাম বা 'ফরিয়াদ' কবিতা শুনবেন না ব'লে 'এ তো বড়ো রঙ্গ যাদু' দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করতাম, তাহলে সেই গোলমালের কাছে হার মেনে, আবৃত্তিশিল্পের স্বাতন্ত্র রক্ষ া এবং ভালো কবিতার কাছে শ্রোতাকে নিয়ে যাবার আমার যে দায়িত্ব, তার থেকে আমি বিচ্যুত হতাম। একথা আমি বলছি না যে, সব সময়ই আমি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com